৭

পঞ্চায়েতে ক্ষমতায়ন ঃ পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নতুন নয়। ১৮৮৪ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্ব-শাসন আইনের মাধ্যমে প্রথম ত্রি-স্তরীয় জনপ্রতিনিধিমূলক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। আর ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনের দ্বারা ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানীয় ব্যাপারে জনসাধারণের উদ্যোগ বা অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল সামান্যই। আর সেই কালে এবং সেই স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণের কোনো প্রশ্নই ছিল না।

স্বাধীনতার পরে ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ও ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইনের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে চারস্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কিন্তু কার্যত সত্তরের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৩ সালে উপরোক্ত দুটি আইনকে একত্রিত করে, আর সেই সঙ্গে নতুন কিছু বিধান সংযোজিত করে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (West Bengal Panchayat Act, 1973) প্রণীত হয়। কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এ রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হয়নি। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার অশোক মেহ্‌টা কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৩ সালের আইনে কয়েকটি সংশোধনি গ্রহণ করেন, এবং তখনই এ রাজ্যে ত্রি-স্তর ও রাজনৈতিক দলভিত্তিক স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে অন্য অনেক রাজ্যে যেসব কারণের জন্য নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি, তার মধ্যে অন্যতম হল সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নীচুতলায় ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিচ্ছা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই জেলা থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্থানীয় স্ব-শাসনের মাধ্যমে জনগণের উন্নয়নে বিশ্বাসী। আর তাই ১৯৭৮ সাল থেকেই এ রাজ্যে প্রতি ৫ বছর অন্তর নিয়মিতভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে, যা সারাভারতে প্রায় ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে। আর অশোক মেহ্‌টা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এ রাজ্যে নির্বাচন সম্পূর্ণই রাজনৈতিক দলভিত্তিক হওয়ায় এখানে পঞ্চায়েত একাধারে একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে উঠেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিই হল দলীয় রাজনীতি এবং দলভিত্তিক

নির্বাচন। অ্যাসেম্বলি ও পার্লামেন্টেও তো দলভিত্তিক নির্বাচনই হয়। সুতরাং তৃণমূল স্তরেও দলভিত্তিক নির্বাচন হওয়াই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে ভূমিসংস্কারকে পঞ্চায়েতি রাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি মালিকের জন্য জমির নির্ধারিত ঊর্ধ্বসীমার উপরে উদ্বৃত্ত জমি পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বণ্টন করে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুরানো কাঠামো চূর্ণ করে গণতান্ত্রিক কাঠামো গঠন করার পথ দেখানো হয়েছে। এখনও কোনো কোনো জেলায় অনেক খাস জমি পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই উদ্ধার করা হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে নানাবিধ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলিকেও পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই রূপায়িত করার ফলে জনসাধারণের সাথে পঞ্চায়েতের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই প্রক্রিয়ায় নারীর স্থান কোথায় এবং কতটুকু?

প্রাথমিক পর্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার আদর্শগতভাবেই সামাজিক ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ। কিন্তু প্রথমদিকে রাজ্য সরকার সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব উচ্ছেদে যতখানি উৎসাহী ছিলেন, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর আর্থসামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ততখানি উদ্যোগী ছিলেন না। ১৯৯২ সালের সংবিধান সংশোধনি আইনের মাধ্যমে সব রাজ্যে পঞ্চায়েতের এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রগতিশীল রাজ্যেও পঞ্চায়েতে নারীর উপস্থিতি ছিল যৎসামান্য। যদিও মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে পঞ্চায়েতে মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রথম থেকেই ছিল। আবার কোনো কোনো রাজ্যে সংরক্ষিত আসনের কিছু অংশ নির্দিষ্ট থাকতো তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলাদের জন্য। কিন্তু এ রাজ্যে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনির পূর্বে কোনো সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। তবে সত্তর ও আশির দশকে মহিলা এবং তপশিলী জাতি/উপজাতি মানুষের দু-একজনকে কো-অপ্ট করে পঞ্চায়েতে নেবার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া সত্তর এবং আশির দশকেও এ রাজ্যে কোথাও কোথাও মহিলারা সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়ে পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবে তাঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিশেষত নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার প্রধান অসুবিধা হল এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের

অভাব। ১৯৯৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি পুস্তকের[১] মধ্যে শুধু নেইল ওয়েবস্টার-এর পুস্তকে তার সমীক্ষিত পঞ্চায়েত দুটিতে নারী এবং অন্যান্য অবর শ্রেণীর অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ওয়েবস্টার কর্তৃক সমীক্ষিত পঞ্চায়েত দুটি হল বর্ধমান জেলার কানপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সালদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত (সমীক্ষক পঞ্চায়েত দুটির আসল নাম প্রকাশ করেননি)। এই সমীক্ষা অনুসারে ১৯৭৮ সালে কানপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন মহিলা। ইনি সাধারণ বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত নির্বাচিত সদস্যা ছিলেন। আর ১৪ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৫ জন ছিলেন তপশিলী জাতিভুক্ত (২ জন কো-অপ্ট করা এবং বাকি ৩ জন নির্বাচিত)। ১৯৮৩ সালে কোনো মহিলা সদস্য ছিলেন না। মোট ১১ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৩ জন ছিলেন তপশিলী জাতির নির্বাচিত সদস্য। আর ১৯৮৮ সালের নির্বাচিত মোট ১৪ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন তপশিলী জাতিভুক্ত নির্বাচিত মহিলা সদস্য ছিলেন। বাকি ১৩ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৪ জন ছিলেন তপশিলী জাতি, এবং এঁদের মধ্যে ১ জন ব্যতীত বাকি সবাই ছিলেন নির্বাচিত সদস্য।[২]

নেইল ওয়েবস্টার-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত তিনটি নির্বাচনে মোট ৬ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে ৪ জন ছিলেন শুধু গৃহবধূ, যাঁদের কোনো নিজস্ব অর্থকরী পেশা ছিল না। ১ জন ছিলেন ছাত্রী, আর বাকি ১ জন বিড়ি তৈরি করতেন। পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের অধিকাংশ পরিবার ছিল ভূমিহীন অথবা ক্ষুদ্র জমির মালিক। এদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল শিক্ষকতা অথবা ছোটো ব্যবসা।[৩] অর্থাৎ এখানে পঞ্চায়েতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়েছিল। অনুমান করা যায়, ভূমিসংস্কারের ফলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা পঞ্চায়েত রাজনীতিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে জি. কে. লিয়েনটেন-এর[৪] সমীক্ষা অনুসারেও বর্ধমান জেলার মেমারি (ব্লক-২) পঞ্চায়েত সমিতিতেও ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে নিম্নবর্গের প্রান্তিক চাষি, কৃষি শ্রমিক এবং ছোটো ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল যৎসামান্য। ১৯৯৯ সালে ১৪১ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৪ জন অর্থাৎ ১০ শতাংশ ছিলেন মহিলা। উপরোক্ত ২টি সমীক্ষাকে অনুসরণ করে বলা যায় যে স্থানীয় স্ব-শাসনের রাজনীতিতে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও সত্তর এবং আশির দশকে স্থানীয় রাজনীতিতে মহিলাদের বিশেষ স্থান হয়নি। ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনি পঞ্চায়েত রাজনীতিতে নারীর প্রবেশাধিকারের পথকে সুগম করে।

এখানে ১৯৯৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি ২টি আলাদা অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। প্রথম অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে এ রাজ্যে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিও এসে যাবে। আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে ১৯৯৮ সালের নির্বাচনের পর পঞ্চায়েত রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে।

নারী ও অবর শ্রেণীর ক্ষমতায়ন, ১৯৯৩

১৯৯২ সালের ৭৩তম সংবিধান সংশোধনির পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েতি আইনে কিছু সংশোধনির মাধ্যমে এই রাজ্যেও পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে নারীর জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন (তপশিলী জাতি/উপাজাতি নারী সহ) সংরক্ষিত রাখার নীতি গ্রহণ করেন। আর সেই সঙ্গে গৃহীত হয় অবর শ্রেণীর তপশিলী জাতি/উপজাতি মানুষের জন্য নিজ নিজ গোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের নীতি। তপশিলী জাতি/উপজাতি সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত থাকে এই গোষ্ঠীর নারীদের জন্য। আর সংরক্ষিত সব আসনই আবর্তিত হওয়ার নিয়মও গৃহীত হয়। ১৯৯৩ সালে মে মাসে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েতের নির্বাচনে এই নতুন নীতিই অনুসৃত হয়। আরও উল্লেখ্য যে প্রায় সব রাজ্যেই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) জন্য একটি আলাদা বিভাজন করে আলাদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওবিসি নারী-পুরুষের জন্য কোনো সংরক্ষণ নেই। নির্বাচনে ওবিসিরাও সাধারণ বিভাজনের মধ্যেই পড়েন।

১৯৯৩ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ৩২২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩২৮টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ১৭টি জেলা পরিষদে নতুন আইন অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সারণি ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৩টি স্তরে মোট ৭১,১২০টি আসনের মধ্যে ৪২,০৫১টি আসনকে (৫৯ শতাংশ) সংরক্ষিত রাখা হয়। এর মধ্যে ২৪,৮৯৫টি আসন (৩৫ শতাংশ) সংরক্ষিত ছিল নারীদের (তপশিলী জাতি/উপজাতি নারী সমেত) জন্য। এই ৩৫ শতাংশ আসনকে ঘোষিত সরকারি নীতির (৩৩.৩ শতাংশ) থেকে বেশি বলা যায় না। মোট আসনের ভগ্নাংশজনিত কারণেই এটি হয়েছে। সারণি ১-এ আরও প্রতিফলিত হচ্ছে যে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে তপশিলী জাতি/উপজাতির নারী-পুরুষের জন্য সংরক্ষিত ছিল যথাক্রমে ৩৭.২৮ শতাংশ, ৩৫.৮২ শতাংশ এবং ৩৪.৬০ শতাংশ আসন। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনির পর পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় নারী এবং

সারণি ১

১৯৯৩ সালের নির্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে নারী এবং অন্যান্য অবর শ্রেণীর সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত আসন

স্তর	সাধারণ পুরুষ	সাধারণ নারী (সংরক্ষিত)	তপশিলী জাতি/উপজাতি পুরুষ (সং)	তপশিলী জাতি/উপজাতি নারী (সং)	মোট তপশিলী জাতি/উপজাতি আসন	মোট আসন	নারীর জন্য সংরক্ষিত মোট আসন
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
গ্রাম পঞ্চায়েত	২৪৭১১ (৪০.৫০)	১৩৫৫৩ (২২.২১)	১৪৮১১	৭৯৩৬	২২৭৪৭ (৩৭.২৮)	৬১০১১ (১০০.০০)	২১৪৮৯ ৩৫.২২)
পঞ্চায়েত সমিতি	৪০৭১ (৪৩.০৭)	১৯৯৬ (২১.১১)	২২০০	১১৮৬	৩৩৮৬ (৩৫.৮২)	৯৪৫৩ (১০০.০০)	৩১৮২ (৩৩.৬৬)
জেলা পরিষদ	২৮৭ (৪৩.৭৫)	১৪২ (২১.৬৫)	১৪৫	৮২	২২৭ (৩৪.৬০)	৬৫৬ (১০০.০০)	২২৪ (৩৪.১৪)
মোট	২৯০৬৯	১৫৬৯১	১৭১৫৬	৯২০৪	২৬৩৬০	৭১১২০	২৪৮৯৫

সূত্র : *Panchayati Raj*, Government of West Bengal, March-April and May-June, 1993.

অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের প্রতি সামাজিক সুবিচারের পথটি কিছুটা উন্মুক্ত হয়েছে, আর সেই সাথে বিকেন্দ্রিকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও হয়েছে পূর্বাপেক্ষা বেশি অর্থবহ। প্রসঙ্গত এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে কয়েকটি রাজ্যে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনির সুপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষণের নীতি কার্যকর হয়নি।

সারা পশ্চিমবঙ্গের নারী এবং অবর শ্রেণীর জন্য এই সংরক্ষণের চিত্র থেকে আমরা অবশ্যই বিভিন্ন জেলার স্থানীয় চিত্র পাই না। স্থানীয় অর্থনীতি, জনসংখ্যা এবং মানুষের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির বিভিন্নতা নির্বিশেষে সব জেলার প্রতিটি স্তরেই নারীর অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করা কাম্য। কিন্তু শ্রী গিরিশ কুমার ও বুদ্ধদেব ঘোষ তাঁদের সমীক্ষিত ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে (বর্ধমান জেলার মেমারি ব্লক-এর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, মালদহের সাহপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ব্লকের ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নদিয়া জেলার হরিণঘাটা ব্লক-এর কাশডাঙ্গা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত) দেখেছেন যে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিরা গড়ে ছিলেন মাত্র

৩০ শতাংশ, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের কম। তবে এই ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমীক্ষা অনুসারে সাধারণ প্রতিনিধিদের মধ্যে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ৭.৭৩ শতাংশ। মধ্যবর্ণের মানুষেরই ছিল প্রাধান্য (৪১.৫১ শতাংশ)। তার পরের স্থানটি ছিল তপশিলী জাতি/উপজাতি জনগোষ্ঠীর (২৯.৩০ শতাংশ)। সমীক্ষকদ্বয় আরও লিখেছেন যে, "Caste status generally, though necessarily reflects class position also. The incidence of poverty is more acute among the lower castes."[৫] পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৯টি জেলার ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম এবং নদিয়া, এই ৩টি জেলার পঞ্চায়েতকে এখানে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হল। ত্রি-স্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েতের গ্রামস্তরটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়েই এখানে আলোচনা সীমিত থাকবে।

সারণি ২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৩টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে গড়ে অন্যূন ৩৩.৩ শতাংশ নারী নির্বাচিত হয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও নদিয়ায়

সারণি ২

৩টি জেলার (দঃ ২৪ পরগনা, বীরভূম ও নদিয়া) গ্রাম পঞ্চায়েতে নারী-পুরুষ সদস্য, ১৯৯৩*

	দক্ষিণ ২৪ পরগণা			বীরভূম			নদিয়া		
	গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৩১২			গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৬৯			গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৮৭		
বিভাজন	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ
সাধারণ	৩১০৩	১০২৫	২০৭৮	১৬৫০	৫৩৬	১১১৪	২২৬৫	৭৬৩	১৫০২
	(৫২.৫৮)	(১৭.৩৭)	(৩৫.২১)	(৫৫.৮০)	(১৮.১১)	(৩৭.৭০)	(৬১.৩৮)	(২০.৬০)	(৪০.৭০)
তপশিলী	২৬৫৫	১০০০	১৬৫৫	১০৩১	৩৮৯	৬৪২	১২৯৫	৪৯৯	৭৯৬
জাতি	(৪৫.০০)	(১৬.৯৫)	(২৮.০৫)	(৩৪.৯)	(১৩.১৬)	(২১.৭০)	(৩৫.১০)	(১৩.৫২)	(২১.৫৮)
তপশিলী	১৪৩	৫৪	৮৯	২৭৪	১২৩	১৫১	১৩০	৫৫	৭৫
উপজাতি	(২.৪২)	(০.৯১)	(১.৫১)	(৯.২৭)	(৪.১৬)	(৫.১১)	(৩.৫২)	(১.৪৯)	(২.০৩)
মোট	৫৯০১	২০৭৯	৩৮২২	২৯৫৫	১০৪৮	১৯০৯	৩৬৯০	১৩১৭	২৩৭৩
	(১০০.০০)	(৩৫.২৩)	(৬৪.৭৭)	(৯৯.৯৭)	(৩৫.৩৬)	(৬৪.৫১)	(১০০.০০)	(৩৫.৬১)	(৬৪.৩১)

* বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা শতাংশ নির্ণয় করছে।

সূত্র : 1. *Socio-Economic Profile of Panchayat Members*, Government of West Bengal, Institute of Panchayats and Rural Development, South 24-Paragana, p. 3;
2. Ibid., Birbhum, p. 3. and
3. Ibid., Nadia, p. 3.

তপশিলী জনজাতির সংখ্যাধিক্য পঞ্চায়েতেও প্রতিফলিত হয়েছে। আর বীরভূমে তপশিলী উপজাতির জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ার ফলে অন্য ২টি জেলা অপেক্ষা এখানে এই গোষ্ঠীর নারী-পুরুষের প্রতিনিধিত্বও কিছুটা বেশি। এখন প্রশ্ন হল, এই জনপ্রতিনিধিরা, বিশেষত মহিলা সদস্যরা, শিক্ষা এবং আর্থিক কাঠামোর কোন্ স্তরে অবস্থান করতেন? আর পঞ্চায়েতে কোন্ জাতিবর্ণ ও শ্রেণীর মানুষরাই বা আধিপত্য করেছেন?

পঞ্চায়েত সদস্যাদের শ্রেণী ও শিক্ষা

সাধারণত আয় এবং সম্পত্তির মালিকানা দিয়েই শ্রেণী নির্ণয় করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ নারীর নিজস্ব কোনো অর্থকরী পেশা কিংবা উল্লেখযোগ্য উপার্জন না থাকলেও তাদের পারিবারিক আয়, অর্থাৎ স্বামী অথবা অন্য কোনো পুরুষ অভিভাবকের আয় এবং জমির মালিকানা দিয়ে মহিলা সদস্যদের শ্রেণীগত চিত্র পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ্য যে কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সদস্যদের আয়ের প্রধান উৎসই হল কৃষি। এ রাজ্যে ভূমিসংস্কারের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে জমির উচ্চ মালিকানার উচ্ছেদ ঘটার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা (পঞ্চায়েত সদস্যারা সহ) কৃষিতে নিযুক্ত থাকেন চাষি, ভাগ চাষি এবং শ্রমিকরূপে। তবে ভূমিহীনতা সব সময় দারিদ্র্যের সূচক হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, ভূমিহীন মানুষও চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষকতা প্রভৃতির মাধ্যমে ভালো উপার্জন করেন। এই ৩টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা কৃষি ছাড়াও কারিগর (কামার, কুমোর, ছুতোর ইত্যাদি) জেলে, পশুপালক, নানা ধরনের ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ী, শিক্ষক এবং চাকুরিজীবী রূপেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। তবে একই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও আবার আয়ের প্রধান উৎসের পার্থক্য তো থাকেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত), বীরভূম (১৬৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত), এবং নদিয়া (১৮৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত), এই তিনটি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের যথাক্রমে ৪৪ শতাংশ, ৫১ শতাংশ এবং ৩৬ শতাংশ সদস্যের বাৎসরিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমা ছিল ৪ হাজার টাকা। অর্থাৎ এই সদস্যরা সকলেই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম ও নদিয়ায় ৪ হাজার-১১ হাজার টাকার মধ্যে বাৎসরিক আয় ছিল যথাক্রমে ৩৯ শতাংশ ও ৪৪ শতাংশ সদস্যের। অনুরূপে যথাক্রমে ১২ শতাংশ, ৭ শতাংশ এবং ১২ শতাংশের আয় ১১০১ হাজার-২৫ হাজারের মধ্যে ছিল। ২৫ হাজার ও তার ঊর্ধ্ব আয়ের সদস্য ছিলেন খুবই কম শতাংশ। এঁদের মধ্যে আবার তপশিলী জাতি/উপজাতি সদস্য ছিলেন খুবই নগণ্য।[৬]

জমির মালিকানার যে চিত্র সরকারি রিপোর্টে ফুটে উঠেছে, তাতে দেখা যায় যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম ও নদিয়া জেলার উপরোক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতেগুলির যথাক্রমে ৫২ শতাংশ, ৪৩ শতাংশ এবং ৪৬ শতাংশ সদস্যের জমির পরিমাণ ২.৫০ একরের নীচে, আর যথাক্রমে ৮.৫২ শতাংশ, ১৫ শতাংশ এবং ১২.৫ শতাংশ সদস্যের জমির পরিমাণ ২.৫০ একর-৫ একরের মধ্যে ছিল। মাত্র ৩-৫ শতাংশ সদস্যের জমির মালিকানা ছিল ৫-১০ একরের মধ্যে। তার উর্ধ্বে জমি ছিল খুব নগণ্য সংখ্যক সদস্যের। সুতরাং বলা যায় যে জমির মালিকানা যাদের আছে (পাট্টাদারদের বাদ দিয়ে), তাদেরও অধিকাংশই ছিলেন ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি জমির মালিক, আর জমির মালিকানার দিক দিয়েও সাধারণভাবে নিম্নতর এবং নিম্নতম স্থানে অবস্থান ছিল যথাক্রমে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি সদস্যদের।[৭]

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের আয় এবং জমির মালিকানার চিত্র থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাই স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থার দায়িত্বে এসেছিলেন। আর এই তথ্যের ভিত্তিতেই বলা যায় যে নারী সদস্যদের ব্যক্তিগত আয় এবং জমির মালিকানা না থাকলেও (ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া) এঁরাও সাধারণভাবে গ্রামের মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্তই ছিলেন। উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলাদের পঞ্চায়েতে বিশেষ স্থান ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্টে উপরোক্ত ৩টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার কম হার এবং নারীদের মধ্যেও আবার তপশিলী জাতি ও উপজাতি নারীশিক্ষার নিম্নতর ও নিম্নতম হারই প্রতিফলিত হয়েছে। সদস্যরা প্রায় সকলেই বিবাহিত এবং ২০-৪০ বছর বয়সী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এঁরা শিক্ষার সুযোগ এবং সময় পেয়েছেন কম। অধিকাংশ সদস্যের শিক্ষা বিদ্যালয়ের সীমানা অতিক্রম করতে পারেনি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যরা গড়ে ৩৪.৮ শতাংশ এবং ৪০.২২ শতাংশ যথাক্রমে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত ছিলেন। তবে এখানেও তপশিলী জাতি এবং উপজাতি সদস্যরা ছিলেন যথাক্রমে নিম্নতর এবং নিম্নতম স্থানে। প্রাথমিক স্তরে তপশিলী জাতি এবং উপজাতির সদস্যাদের শিক্ষার হার ছিল যথাক্রমে ৩৭.৬২ শতাংশ এবং ২০ শতাংশ। আর মাধ্যমিক স্তরে তপশিলী জাতি ও উপজাতি নারীদের শতাংশ ছিল যথাক্রমে ২৫ শতাংশ এবং ১৭ শতাংশ। সাধারণ নারীদের মধ্যে স্নাতক স্তরের শিক্ষার শতকরা হার ছিল ৭.৩২, আর তপশিলী জাতির নারীর ক্ষেত্রে এই স্তরের শিক্ষার হার ছিল ৩.৬০ শতাংশ। তপশিলী উপজাতির মধ্যে স্নাতকোত্তর কেউ ছিলেন না। সাধারণ

সদস্যাদের মধ্যে নিরক্ষর ছিলেন ০.৭৮ শতাংশ, কিন্তু তপশিলী জাতি এবং উপজাতির সদস্যাদের নিরক্ষরতার হার ছিল যথাক্রমে ১.৯০ শতাংশ এবং ৫.৫৫ শতাংশ। সাধারণভাবে নারীদের তুলনায় পুরুষদের শিক্ষা ছিল উচ্চমানের। পুরুষ সদস্যদের মধ্যে প্রায় কেউ-ই নিরক্ষর ছিলেন না।[৮] বীরভূম ও নদিয়া জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতেও কমবেশি অনুরূপ চিত্রই পাওয়া যায়।[৯]

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে যে নারীরা তৃণমূল স্তরে রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন, তাঁরা স্বামী কিংবা অন্য কোনো পুরুষ অভিভাবকের সূত্রে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তরভুক্ত এবং শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন বিশেষ অসুবিধাভোগী।

নারীর ক্ষমতায়ন, ১৯৯৮

প্রথমেই উল্লেখ্য যে এই অনুচ্ছেদটি মূলত লেখিকার ব্যক্তিগত সমীক্ষার উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ভূমিকায় বলা হয়েছে।

১৯৯৩ সালের নির্বাচনে নারীসহ নিম্নবর্গের মানুষের স্থানীয় স্ব-শাসনে যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়, ৫ বছর পরে ১৯৯৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তা আরও

সারণি ৩

১৯৯৮ সালের নির্বাচনে পঞ্চায়েতের ৩টি স্তরে নারী-পুরুষ প্রতিনিধিত্ব

জাতি/বর্ণ	গ্রাম পঞ্চায়েত মোট	নারী	পুরুষ	পঞ্চায়েত সমিতি মোট	নারী	পুরুষ	জেলা পরিষদ মোট	নারী	পুরুষ
সাধারণ	৩২৬৬৫	১০৯৯০	২১৬৭৫	৫৬৭২	১৮৪১	৩৮৩১	৪৬৭	১৫৪	৩১৩
	(৬৬.৩৫)	(২২.৩২)	(৪৪.০৩)	(৬৬.২৪)	(২১.৫০)	(৪৪.৭৪)	(৬৫.২২)	(২১.৫১)	(৪৩.৭১)
তপশিলী জাতি	১৩৩৮০	৫১৫৬	৮২২৪	২৩১৬	৮৬০	১৪৫৬	১৯৯	৭৪	১২৫
	(২৭.১৮)	(১০.৪৭)	(১৬.৭১)	(২৭.০৪)	(১০.০৪)	(১৭.০০)	(২৭.৭৯)	(১০.৩৩)	(১৭.৪৫)
তপশিলী উপজাতি	১৩৮৯	১৩৯১	১৭৮৯	৫৭৪	২১২	৩৬২	৫০	১৫	৩৫
	(৬.৪৭)	(২.৮২)	(৩.৬৫)	(৬.৭০)	(২.৪৭)	(৪.২৩)	(৬.৮৯)	(২.০৯)	(৪.৮৯)
মোট	৪৭,৪৩৪	১৭৫৩৭	৩১৬৮৮	৮৫৬২	২৯১৩	৫৬৪৯	৭১৬	২৪৩	৪৭৩
	(১০০.০০)	(৩৫.৬১)	(৬৪.৩৯)	(৯৯.৭৪)	(৩৫.০২)	(৬৫.৯৮)	(১০০.০০)	(৩৩.৯৪)	(৬৬.০৭)

সূত্র : *Information on West Bengal Panchayats*, Government of West Bengal, State Institute of Panchayats and Rural Development, West Bengal, Kalyani, Nadia, 1999, pp. 161, 162-182 and 183.

সম্প্রসারিত হয়। সারণি ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে ১৬টি জেলার (দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য এলাকা বাদ দিয়ে) মোট ৪৯,২৩৪ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং ৮,৫৬২ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যর মধ্যে নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে ৩৫.৬২ শতাংশ এবং ৩৫.০২ শতাংশ। আর জেলা পরিষদ স্তরে মোট ৭১৬ জন সদস্যের মধ্যে নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল ৩৩.৯৪ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতিটি স্তরেই মোট আসনের অন্যূন এক-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে নারীরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভগ্নাংশজনিত সুবিধাটি নারীরাই পেয়েছেন। লক্ষণীয় যে সাধারণ নারীরা ৩টি স্তরেই মোটামুটি ২২ শতাংশ আসন লাভ করেছেন। আর তপশিলী জাতি ও উপজাতি নারীরা আছেন নিম্নতর ও নিম্নতম স্থানে (যথাক্রমে ১০ এবং ৩ শতাংশ। সুতরাং বলা যায় যে পঞ্চায়েতে সাধারণ এবং তপশিলী জাতি/উপজাতি নারীর এই অবস্থান তাদের নিজ নিজ আর্থসামাজিক অবস্থানেরই অনুরূপ।

সদস্যাদের শ্রেণী ও শিক্ষা

ব্যক্তিগত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আলোচিত ৫টি জেলার ১০টি ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যাদের অধিকাংশই ছিলেন গৃহবধূ, যাঁদের নিজস্ব কোনো অর্থকরী পেশা ছিল না। কিন্তু তাঁরা গড়ে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারভুক্ত ছিলেন। অনেক পরিবারই চাষের সাথে যুক্ত। অধিকাংশ চাষি পরিবারে মহিলারাও চাষ ও ফসল তোলার কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। যাঁদের নিজেদের কোনো চাষের জমি নেই, তাঁরাও অনেক সময় ভাগ চাষ করেন। এছাড়া আছে পাট্টা চাষ ও অগ্রিম চাষ। অগ্রিম চাষের ক্ষেত্রে ভূমিহীন মানুষ চাষের মরশুমে কিছু টাকার বিনিময়ে অন্যের জমি নিয়ে নেন চাষের জন্য। সার, বীজ ইত্যাদি ধার নিয়ে পরিবারের মহিলারা সহ সবাই মিলে চাষ করে ফসল ঘরে তোলেন। আর তখনই পরিশোধ করেন জমির মালিকের ঋণ। অগ্রিম চাষের ক্ষেত্রে চাষ করা যায় অনেকটা নিজের জমিতে চাষ করার মতো, অন্যের জমিতে শ্রমিকের মতো নয়। তবে এমনও কিছু পঞ্চায়েত সদস্যা ছিলেন, পেশায় যারা কৃষি শ্রমিক। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার ব্লক-১-এর অন্তর্গত দেয়াচক গ্রাম পঞ্চায়েতের সুফিয়া বিবি, সাগর ব্লকের ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জাহানারা বিবি, হুগলি জেলার চণ্ডিতলা-১ ব্লকের নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আনোয়ারা বেগম, বীরভূম জেলার বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পূর্ণিমা হাঁসদা এবং মেদিনীপুরের সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরি মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবিত্রি পাতোর বলেছেন যে তাঁরা পেশায় কৃষি শ্রমিক। কৃষি নির্ভর জীবিকা ছাড়াও পঞ্চায়েত সদস্যাদের অন্যান্য পারিবারিক জীবিকা হল পশুপালন, নানাবিধ কুটির শিল্প, ছোটো ব্যবসা (দোকান) ডাক্তারি (হোমিওপ্যাথি), অফিসের করণিক এবং

শিক্ষকতা প্রভৃতি। প্রতিটি ব্লকেই ২/৪ জন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকাও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা। সাগর ব্লকের কয়েকজন সদস্যা ছিলেন মৎস্যজীবী পরিবারভুক্ত। উদাহরণরূপে বলা যায় যে ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উর্মিলা দলুই-এর স্বামী নিকটবর্তী জম্বুদ্বীপ থেকে মাছ এবং কাঁকড়া ধরে এনে পাইকারের কাছে বিক্রি করতেন। উর্মিলা নিজেও সাগরে মিনি বাগদা ধরতেন। আর তাঁর পারিবারিক অল্প কিছু জমিতে চাষ হত ধান, তরমুজ, খেসারি ডাল ও লংকা ইত্যাদি। জাহানারা বিবির স্বামীও সাগরে মাছ ধরতেন, এবং ফিসারি থেকে মাছ এনে পাইকারের কাছে বিক্রি করতেন। আবার কোনো কোনো পরিবারের ছিল এক বা একাধিক পানের বরোজ।

সাধারণভাবে পঞ্চায়েত সদস্যাদের গড় শিক্ষার মান ছিল স্কুলের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে এরই মধ্যে ২/৪ জন স্নাতক সদস্যা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ২/৪ জন নব সাক্ষর, যাঁরা শুধু নিজের নামটুকুই সই করতে পারতেন। শিক্ষা এবং আয়ের দিক থেকে তপশিলী উপজাতি মহিলারাই আছেন সব থেকে নীচে। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ পঞ্চায়েত সদস্যা পাওয়া যায় কদাচিৎ। সংক্ষেপে বলা যায়, সমীক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সদস্যারা ছিলেন সাধারণভাবে অল্প শিক্ষিত, এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ শিক্ষিত মহিলা প্রায় অনুপস্থিত। তবে এ হল শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতের চিত্র। পঞ্চায়েত সমিতিগুলির চিত্র একটু আলাদা। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যাদের গড় শিক্ষার স্তর এবং পারিবারিক আয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যাদের থেকে অনেকটাই ভালো। আর পঞ্চায়েতের উচ্চতম স্তরে অর্থাৎ জেলা পরিষদে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষিত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সদস্যা আছেন বেশ কিছু। উচ্চস্তরের নির্বাচনে প্রার্থী দেবার সময় স্বাভাবিক কারণেই প্রার্থীর শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী একই জেলার বিভিন্ন ব্লকে এবং একই ব্লকের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতেও কিছুটা আলাদা আলাদা চিত্র তো আছেই।

একথা অনস্বীকার্য যে সংরক্ষণের ফলেই অল্প শিক্ষিত এবং মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সাধারণ এবং তপশিলী জাতি/উপজাতি নারীরা এখন তাঁদের নিজ নিজ আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় স্থান করে নিতে পেরেছেন। অন্যথায় পিতৃতান্ত্রিক এবং পুরুষশাসিত সমাজে এতগুলি আসনে নারীদের পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই সম্ভব হত না। নারীর প্রতিটি পদক্ষেপেই আজও ছড়ানো আছে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জাল।

সদস্যাদের যোগ্যতার প্রশ্ন

এখন প্রশ্ন হল, পঞ্চায়েতের এই সদস্যারা কি তৃণমূল স্তরের রাজনীতির যোগ্য? আর কিভাবেই বা তাঁরা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করছেন? তাঁরা কি শুধুই পুরুষ আত্মীয়দের 'প্রক্সি' রূপে কাজ করছেন?

এখানে প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দল ভিত্তিক। দলীয় ভিত্তিতেই প্রার্থী ঠিক করা হয়। ফলে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত সদস্যরা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। বামফ্রন্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তম দল সিপিআই (এম)-এর মহিলা শাখা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বহু বছর ধরে এ রাজ্যে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মহিলাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার কাজে ব্রতী আছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এ রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যাদের মধ্যে অনেকেই গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যা। সুতরাং এই দলের মহিলা প্রতিনিধিদের অনেকেরই কিছুটা রাজনৈতিক সচেতনতা আগেই থাকে। কিছু সদস্যা আছেন, যাঁরা দলের সারাক্ষণের কর্মী। আর কোনো দলের মহিলা শাখা না থাকলেও পরিবারের দলীয় পুরুষ সদস্যদের মাধ্যমে নারীরা কিছুটা রাজনৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকেন। একথা সত্য যে অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও পঞ্চায়েতের মহিলা প্রতিনিধিদের অধিকাংশই এমন কোনো ব্যক্তির স্ত্রী অথবা এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট আত্মীয়া যিনি বা যাঁরা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য, সক্রিয় কর্মী অথবা দ্বিধাহীন সমর্থক। আর এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসন ছেড়ে দিতে হচ্ছে বলে অন্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও পুরুষেরাই নিকট আত্মীয়াকে সেই আসনে পাঠাবার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। এতে আসনটি পরিবারের মধ্যেই থাকে। আর সঙ্গে কিছু প্রচ্ছন্ন আর্থিক কিংবা অন্য সুবিধাও হয়তো থাকে। সমীক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্যাদের অধিকাংশেরই পিতৃকুল অথবা শ্বশুরকুলের একাধিক ব্যক্তি, এমনকি অনেক সময় শাশুড়ি, ননদও বিভিন্ন দলের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। কয়েকজন সদস্যা আবার ইতিমধ্যে দল পরিবর্তনও করেছেন। সুতরাং পারিবারিক সূত্রে অন্তত কিছুটা রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং মানসিকতা বেশ কিছু সদস্যারই আছে। নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী দেবার সময়ও প্রার্থীর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং পারিবারিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ যথাসম্ভব দেখে নেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরি গ্রাম পঞ্চায়েতটি সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। ১৯৯৩ সালের নির্বাচনের সময় থেকেই এই পঞ্চায়েতটি মহিলা পঞ্চায়েত রূপে গড়ে উঠেছে। অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চলে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যারা নানা উন্নয়নমূলক কাজে, বিশেষত সাক্ষরতা এবং খাস জমি বণ্টনের ব্যাপারে কৃতিত্ব অর্জন করে এলাকার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাই ১৯৯৩ সালের নির্বাচনের সময় নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে পুরুষরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনেও এখানে পুরুষ প্রার্থী কেউ ছিলেন না। এটি 'মহিলা পঞ্চায়েত' রূপেই গড়ে উঠেছে। আগেই বলা হয়েছে যে এ ধরনের মহিলা পঞ্চায়েত মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং ত্রিপুরাতেও আছে।

ইদানিংকালে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত সিপিআই (এম), সিপিআই, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি এবং অল্প কিছু জায়গায় আরএসপি এবং এসইউসিআই পঞ্চায়েত নির্বাচনের অংশীদার। ফলে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রত্যেকটি আসনের জন্য ৩/৪ জন করে বিভিন্ন দলীয় প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে

সারণি ৪

৫টি ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের নারী-পুরুষ সদস্য এবং রাজনৈতিক দল, ১৯৯৮

জেলা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	পুরুষ	নারী			মোট সদস্য	রাজনৈতিক দল
		তপঃ জাতি	তপঃ উপজাতি	সাধারণ	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
দঃ ২৪ পরগনা	১২৫	১৯	০	৫০	৬৯	১৯৪	৫-সিপিআই(এম), তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিআই
ফলতা ১৩							
দঃ ২৪ পরগনা	৮৯	২৭	০	২৬	৫৩	১৪২	৩-সিপিআই(এম), তৃণমূল ও কংগ্রেস
সাগর ৯							
হুগলি							
চণ্ডিতলা-১ ৯	১০৪	১৩	০	৪৩	৫৬	১৬০	৪-সিপিআই(এম), তৃণমূল, কংগ্রেস ও বিজেপি।
বীরভূম	৯৭	২০	১৭	২০	৫৭	১৫৪	৫-সিপিআই(এম), তৃণমূল, বিজেপি, আরএসপি ও সিপিআই
বোলপুর-শ্রীনিকেতন ৯							
নদিয়া	২০৫	৭০	৭	৩৭	১১৬	৩২১	৪-সিপিআই(এম), তৃণমূল, কংগ্রেস ও বিজেপি।
চাকদহ ১৭							

সূত্র : সংশ্লিষ্ট ব্লক (পঞ্চায়েত সমিতি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

সংরক্ষণের বাইরেও সাধারণ আসনে মহিলারা নির্বাচিত হয়েছেন। সারণি ৪-এ ৫টি ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের দলীয় যোগাযোগ দেখানো হল। সারণি ৪-এ দেখা যাচ্ছে যে এক একটি আসনের জন্য কমপক্ষে ৩/৪ জন দলীয় প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সাধারণত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনেও এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয় বা হয়েছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে একথা বলা চলে না যে স্থানীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অনীহা আছে।

নির্বাচনে জয়লাভ করার পরে প্রায় প্রত্যেকটি সদস্যাই নিজ নিজ দলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এবং নিজ নিজ দলের নীতিই হয় সদস্যাদের নীতি। অধিকাংশ সময় দলীয় নির্দেশেই তাঁরা পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনা করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে মহিলা সদস্যারা দলীয় (গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি) কাজ এবং পঞ্চায়েতের কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। আর নারী পুরুষ সকলের জন্যই এ কথা সত্য। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দলভিত্তিক হওয়ার ফলে অন্য অনেক রাজ্যের অপেক্ষা এ রাজ্যে পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের দলের প্রতি আনুগত্যও বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

পঞ্চায়েতে দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর জন্য মহিলাদের অবশ্যই কিছুটা সাহায্যের প্রয়োজন হয়। স্বল্পশিক্ষিত অথবা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে একেবারেই নতুন আসা মহিলাদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এ ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করেন দলীয় পুরুষ এবং মহিলা সদস্যরা, অথবা দলের সাথে যুক্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা। অধিকাংশ মহিলা সদস্য নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে প্রথম প্রথম তাঁদের পুকুরেব মাছ সমুদ্রে পড়ার মতো অসহায় মনে হয়েছে। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে সে জড়তা কেটে গেছে। প্রশ্নের উত্তরে সমীক্ষিত সব সদস্যারাই জানিয়েছেন যে পঞ্চায়েতে তাঁদের কোনো সমস্যা হয় না। পুরুষ সদস্যরা সব সময়ই তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কোনো কোনো সদস্যা বলেছেন, "পুরুষরাই তো আমাদের পঞ্চায়েতে পাঠিয়েছে, তা এখন সাহায্য তো করতেই হবে।" আবার কেউ কেউ অকপটে বলেছেন, "পুরুষ সদস্যরা আমাদের সাহায্য করে, তবে তার মধ্যেও মনে মনে একটু অসন্তোষ আছে।" অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে মহিলা সদস্যদের বিরুদ্ধে পুরুষদের মনে একটু চাপা অসন্তোষ কাজ করলেও দলীয় এবং পারিবারিক স্বার্থে সহযোগিতার হাত বাড়াতেই হয়। ক্ষমতার লোভ এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী বিরোধী মনোভাব কি হঠাৎ ত্যাগ করা সম্ভব? তবে যে ব্যবস্থা আইনি বিধানের বলে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তার সাথে সহযোগিতা করাই তো বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক।

প্রশ্ন হল, পুরুষ সদস্যরা সহযোগিতা করেন বলেই কি মহিলা সদস্যদের "পুরুষের প্রক্সি" বলা যায়? মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে

এবং বিভিন্ন গণআন্দোলনে যোগদানকারী মহিলারাও পারিবারিক সূত্রেই রাজনীতিতে এসেছিলেন। তাঁরা তরুণ সংগ্রামীদের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন বলেই কী তরুণ সংগ্রামীরা নারীদের 'প্রক্সি' ছিলেন? আর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম থেকে এখনও পর্যন্ত মহিলা সাংসদদের অধিকাংশই তাঁদের পিতা/ভ্রাতা/স্বামী, এমনকি মৃত স্বামীর সূত্র ধরেই সংসদে এসেছেন, আর এঁদের মধ্যে অনেকেই দক্ষতার পরিচয়ও দিচ্ছেন। এঁরাও কি সবাই 'প্রক্সি' সদস্যা? মনে হয় নারী পুরুষ যে পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, পরিপূরক, এ কথাটি মনে রাখলেই অনেক সমস্যা এড়ানো সম্ভব। কিছুটা পুরুষের সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়েও মহিলা সদস্যরা যদি অল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় রাজনীতিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন তবে ক্ষতি কী?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গেরই একজন অভিজ্ঞ পঞ্চায়েত সদস্যের উক্তি : "It is all 'purustantrik' which is there everywhere. Women have been treated as slaves by Muslims, by Brahmins, by Santals, by Chamars, by Sadgopes, and till recently they did not have a voice and were backward, and obviously when they enter into an organisation, they usually are not yet as good as they male members...Don't forget that untill recently we didn't have any of them."[১০] সুতরাং যুগ যুগান্তর ধরে পিছিয়ে থাকা নারীদের জন্য, বিশেষত অধিকতর অনগ্রসর নিম্নবর্গের নারীদের জন্য, একটু সহনশীলতা থাকা উচিত নয় কি? নৈতিক দিক দিয়েও কি যুক্তিসংগত নয়? তাছাড়া, অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা অর্জন করার জন্য তো এক সময় সকলকেই শুরু করতে হয়। পুরুষ সদস্যদের জন্যও একথা সত্য। আরও বড় কথা হল এই যে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যরা পুরুষদের কথা শুনে কাজ করেন, তাহলে বলা যায় যে পুরুষ সদস্যরাও তো কাজ করেন সম্পূর্ণ দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী। সেক্ষেত্রে তাঁরাও কি শুধু দলের 'প্রক্সি' রূপে কাজ করেন?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলাদের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ২০০০-২০০১ সালেই বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে এমন বেশ কিছু নারী ছিলেন, যাঁরা কূট রাজনীতির খেলায় পুরুষদেরও হারিয়ে দিতে পারতেন। অনেকে আবার মিলল সুবক্তাও। এঁরা তৃণমূল স্তরের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনায়াসে এখন রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক রূপে কাজ করার যোগ্য। তৃণমূল স্তরের কঠিন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তিত্বে যে পূর্ণতা আনে, তা কখনোই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নেতৃত্বের মধ্যে পাওয়া যায় না। মনে রাখা প্রয়োজন যে বুদ্ধি বিবেচনা বা মস্তিষ্ক পুরুষ অপেক্ষা নারীর যে কোনো অংশে কম নয়, তা প্রমাণিত

সত্য। আর নারীর আছে একটি অতিরিক্ত গুণ। কাজে একাগ্রতা। প্রয়োজন শুধু কিছু সুযোগ সুবিধা এবং পরিবেশ। সে পরিবেশই এখন তৈরি হচ্ছে পঞ্চায়েত রাজনীতিতে।

মহিলা প্রধানদের দক্ষতার প্রশ্ন

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রধানের আসনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিরপেক্ষ এবং দক্ষ ব্যক্তি প্রধান-এর পদে আসীন থাকলে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। কিন্তু কার্যত প্রত্যেক প্রধানকেই তার দলীয় নীতির সাথে সঙ্গতি রেখেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। সংবিধান সংশোধনি আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের আসনগুলির এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য (তপশিলী জাতি/উপজাতিসহ) সংরক্ষিত আছে। আর প্রধান-এর পদে নির্বাচনের সময় স্বাভাবিক কারণেই মহিলাদের ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং রাজনৈতিক (দলীয়) অভিজ্ঞতার উপর কিছুটা বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সারণি ৫-এ ৪টি জেলার ৬টি ব্লকের ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধানদের জাতিবর্ণ, শিক্ষা ও দলের যে চিত্র দেওয়া হল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৮ জন মহিলা প্রধানের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা আছে বেশ কয়েকজনের। আর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষাও আছে সামান্য সংখ্যক প্রধানের। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তপশিলী সদস্যাদের মধ্যে এই স্তরের শিক্ষার হার অনেক কম।

আইনানুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধানদের এক-তৃতীয়াংশ আসন তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলার জন্য নির্দিষ্ট রাখার নিয়ম। কিন্তু সারণি ৫-এ দেখা যাচ্ছে যে তপশিলী মহিলা প্রধানরা এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশি আসন লাভ করেছেন। একটি ক্ষেত্রে তো (সাগর ব্লকে) প্রধানরা সবাই ছিলেন তপশিলী জাতিভুক্ত। এটা সম্ভব হয়েছে এই তপশিলী জাতি অধ্যুষিত এলাকায় সংরক্ষিত আসনের বাইরেও এই জনগোষ্ঠীর নারীরা সাধারণ আসনে বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হওয়ার ফলে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে যতদূর জানা যায়, অন্য অনেক রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গে কোনো তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলা প্রধানকে অযথা অপমান কিংবা শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়নি। অনুমান করা যায়, এ রাজ্যে তপশিলী জাতি/উপজাতি জনগোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক্য এবং জাতিদ্বন্দ্বের শিথিলতা ও নিজস্ব সংস্কৃতিই এর কারণ।

মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানদের রাজনৈতিক দক্ষতা সম্পর্কে বলা যায় যে ১৯৯৮ সালে নির্বাচিত মহিলা প্রধানদের মধ্যে প্রায় সকলেই ১৯৯৩ সাল থেকে উপপ্রধান অথবা সাধারণ সদস্যা রূপে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। কেউ কেউ আবার ১৯৮৮

সারণি ৫

গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধানদের জাতিবর্ণ, শিক্ষা ও দল, ১৯৯৮

জেলা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	মহিলা প্রধানের নাম	পঞ্চায়েতের নাম	জাতিবর্ণ	শিক্ষা	দল
হুগলি,	অলকা ঘাঁটি	হরিপুর	তপঃজাতি	ষষ্ঠ শ্রেণী	বিজেপি
চণ্ডিতলা-১	গৌরী পাল	গঙ্গাধরপুর	সাধারণ	অষ্টম শ্রেণী	সিপিআই(এম)
৯	অনিতা দলুই	ভগবতীপুর	তপঃজাতি	,,	,,
দঃ ২৪ পরগনা	শিপ্রা বৈদ্য	ভাদুয়া হরিদাসপুর	তপঃজাতি	অষ্টমশ্রেণী	,,
ডায়মন্ডহারবার-২	মঞ্জু মিত্র	কামার পোল	সাধারণ	বি.এ.	তৃণমূল
৮					
দঃ ২৪ পরগনা,	মিঠু মণ্ডল	বেলসিংহা-২	তপঃজাতি	উচ্চমাধ্যমিক	তৃণমূল
ফলতা*	মমতা বাগ	গোপালপুর	সাধারণ	পঞ্চম শ্রেণী	তৃণমূল
১৩	রূপাঞ্জলী কয়াল	হরিণডাঙ্গা	,,	অষ্টম শ্রেণী	সিপিআই(এম)
	রিক্তা প্রামাণিক	চালুয়ারি	তপঃ উপজাতি	উচ্চমাধ্যমিক	তৃণমূল
দঃ ২৪-পরগনা,	রেখা রানি সাহু	মুরিগঙ্গা	তপঃ জাতি	মাধ্যমিক	সিপিআই(এম)
সাগর ব্লক	ঝর্ণা মণ্ডল	ধসপাড়া-সুমতিনগর	,,	মাধ্যমিক	সিপিআই(এম)
৯	ঊর্মিলা দলুই	ধবলাট	,,	অষ্টম শ্রেণী	,,
নদিয়া	শিখা দে	তাতলা	,,	ষষ্ঠ শ্রেণী	,,
চাকদহ	নীলিমা নাগ	দুবড়া	,,	উচ্চমাধ্যমিক	কংগ্রেস
১৭	মমতা রায়	কাঁচড়াপাড়া	সাধারণ (ব্রাহ্মণ)	চতুর্থ শ্রেণী	সিপিআই(এম)
	শকুন্তলা হাঁসদা	ঘেঁটুগাছি	তপঃউপজাতি	নবম শ্রেণী	কংগ্রেস
	গোপা দে	চাঁদুড়িয়া	সাধারণ	এম.এ.বি.টি.	তৃণমূল
	মমতা সরকার	শিমুরালি	সাধারণ	মাধ্যমিক	সিপিআই(এম)

* ফলতা ব্লকের বঙ্গনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে দলীয় দ্বন্দ্বের ফলে নির্বাচিত পুরুষ প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে ২০০১ সালের ১৯ জানুয়ারি ১ জন নির্দল মহিলা প্রার্থীকে প্রধানরূপে পুনর্নির্বাচিত করা হয়েছে।

সূত্র : সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

কিংবা তারও আগে থেকে পঞ্চায়েতে মনোনীত সদস্যা রূপে কাজ করেছেন। সুতরাং মহিলা প্রধানদের অনেকেরই কিছুটা প্রত্যক্ষ পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাও ছিল। তবু অনেক প্রধানই অকপটে বলেছেন যে প্রথম দিকে কিভাবে মিটিং

পরিচালনা করতে হয়, কীভাবে কী বলতে হয়, তা বাড়ি থেকে স্বামী কিংবা অন্য কেউ শিখিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে হুগলি জেলার গোঘাট-২ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদে নির্বাচিত সদস্যা শ্রীমতি দীপ্তি মিত্র বলেছেন, "যখন প্রথম কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হলাম, সংসারী মানুষ, মিটিং করতে ভয় পেতাম। স্বামী বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছেন, তিনি সিপিআই(এম) করেন। স্বামী এবং অন্যরাও শিখিয়ে দিতেন কিভাবে কি বলতে হবে। পরে তো নিজেই সব শিখে নিয়েছি।" এই বক্তব্যকে সমর্থন করে গোঘাট-২ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদে নির্বাচিত আরেকজন সদস্যা শ্রীমতি ঝর্না সেন জানিয়েছেন, "অন্যরা শিখিয়ে দিতো, কিন্তু তার মধ্যেও আবার অনেক সময় হঠাৎই আমাদের বলতে হত। ভয়ে ভয়ে বলতাম। এভাবেই ঠিক হয়ে গেছে।" অভিজ্ঞতা, বাস্তববুদ্ধি এবং একাগ্রতাই দক্ষতা তৈরি করে। গ্রাম পঞ্চায়েতে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে প্রধান নির্বাচিত হন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সহযোগিতাও তাই প্রধানরা পেয়ে থাকেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে পুরুষ প্রধানরাও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সহযোগিতা নিয়েই দলীয় নীতি অনুসারে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। আর ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে সাধারণভাবে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যারাই প্রধানের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতরাং মহিলা প্রধানদের শুধু মহিলা বলেই পঞ্চায়েত পরিচালনায় দক্ষতার অভাবের প্রশ্নই অবান্তর।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে অসুবিধা হয় কিছু স্বল্প শিক্ষিত মহিলা প্রধানদের। উদাহরণরূপে সারণি ৫-এ দেখানো চণ্ডিতলা-১-এর হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং চাকদহ ব্লকের তাতলা ও কাঁচড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কথা উল্লেখ করা যায়। তবে এরা সংখ্যায় কম, এবং আশা করা যায় এদের সংখ্যা ক্রমশই আরও কমে আসবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই অফিসের কাজ চালানোর জন্য নিযুক্ত থাকেন পঞ্চায়েত সচিব, করণিক, সাহায্যকারী ইত্যাদি। আর স্বল্প শিক্ষিত প্রধানরাও সকলেই বাংলায় চিঠি লিখতে বা পড়তে পারেন। আর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের কাজকর্ম সাধারণত বাংলাতেই হয়। অসুবিধা দেখা দেয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে আসা ইংরেজিতে লেখা চিঠি, ইস্তাহার অথবা নথিপত্র নিয়ে। তখনই প্রধানকে শরণাপন্ন হতে হয় কোনো বিশ্বাসভাজন দলীয় সদস্যের। আর এসব ক্ষেত্রেই ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার প্রধানকে উপযুক্ত সম্মান দেন না। আরও একটি সমস্যা উদ্ভব হয় প্রধান এবং উপপ্রধান, এই দুজন ভিন্ন দলভুক্ত হলে। এ রকম ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সম্ভবত এই কারণেই মেদিনীপুরের সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরি মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের আসনটি খালি রেখে দেওয়া হয়েছিল। এই আসনে কাউকে নির্বাচিত করা হয়নি। কুলটিকরি মহিলা পঞ্চায়েতে ৮ জন সদস্যের

মধ্যে ৭ জনই সিপিআই(এম) দলভুক্ত। বাকি ১ জন তৃণমূল সদস্যা প্রায় কখনোই পঞ্চায়েতের অফিসে আসতেন না। তবে এ ধরনের সমস্যা তো পুরুষ প্রধানদের ক্ষেত্রেও আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ব্লক-১-এর অন্তর্গত ধোসা-চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান (পুরুষ) এসইউসিআই দলভুক্ত। আর উপপ্রধান (পুরুষ) ছিলেন তৃণমূল দলভুক্ত। ফলে এই পঞ্চায়েতে চলছিল দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি। সেই সঙ্গে উন্নয়নও ব্যাহত হচ্ছিল। একথা জানিয়েছেন সদস্যারাই।

পঞ্চায়েতের **উচ্চস্তরে মহিলা**

ত্রিস্তর ভিত্তিক স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় সাধারণত গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যারাই উচ্চতর পঞ্চায়েত সমিতি এবং সর্বোচ্চ জেলা পরিষদ স্তরে নির্বাচিত হন। আর এ দুটি স্তরেই স্বাভাবিক কারণেই থাকে শিক্ষার বিশেষ অগ্রাধিকার। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহকারি সভাপতি এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি ছাড়াও এ দুটি স্তরের প্রত্যেকটিতে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য ১০টি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের আসন গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে কিছু মহিলা এসব গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং এঁরা সকলেই পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। উদাহরণরূপে বলা যায় যে সমীক্ষিত জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতি রেবা রানি দে (মাধ্যমিক—বয়স ৪০ উর্ধ্ব) একটি রাজনৈতিক দল ও তাঁর মহিলা শাখার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন, এবং ১৯৯৩ সালে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত উপপ্রধান (সুবক্তা ও সপ্রতিভ) ছিলেন। ১৯৯৮ সালে সমিতির সভানেত্রীর পদে নির্বাচিত হয়ে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছেন। অনুরূপে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতি শিপ্রা মিদ্যা (তপশিলী জাতি, বি. এ., বয়স ৩৫ বছর) একটি রাজনৈতিক দলের দীর্ঘদিনের সক্রিয় কর্মী এবং ১৯৯৩ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যা ছিলেন। ১৯৯৮ সালে সমিতির সভানেত্রীর আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আরও উল্লেখ্য হুগলি জেলার চণ্ডিতলা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতি চায়না চ্যাটার্জীর (ব্রাহ্মণ, বি. এ. বি. টি., অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দলের কর্মী) কথা, যিনি ১৯৮৮ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোনীত সদস্যা ছিলেন। পরে ১৯৯৩ সালে নির্বাচিত সদস্যারূপে সমিতির কর্মাধ্যক্ষ (তৎকালীন ক্ষুদ্র শিল্প, জনকল্যাণ ও ত্রাণ) নির্বাচিত হন, এবং পরে ১৯৯৮ সালে সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হয়ে ওই আসনটিকে প্রকৃত অর্থেই অলংকৃত করছেন। অমায়িক, মৃদুভাষী এই মহিলা অনেকখানি ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও গড়ে তুলেছেন। আরও উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, তালিকা দীর্ঘ হবে। তবে উল্লেখ্য যে

২০০০-২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি জেলার মধ্যে (দার্জিলিং এবং সম্প্রতি সৃষ্ট ৩টি জেলা বাদ দিয়ে) ৭টিতে (বাঁকুড়া, কুচবিহার, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, মালদা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা) জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে আসীন ছিলেন ৭জন মহিলা। আর সেই সঙ্গে ৫টি জেলাপরিষদ-এর (দক্ষিণ দিনাজপুর, হাওড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং উত্তর দিনাজপুর) সহকারি সভানেত্রীর আসনেও আছেন মহিলা। এঁরা প্রায় সকলেই পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। সুতরাং বলা যায় না যে পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় উচ্চস্তরেও দক্ষ মহিলার কোনো অভাব আছে।

নারীর ক্ষমতায়ন, ২০০৩

১৯৯৮ সালের পর ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতে আরও ২টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে ২০০৩ এবং ২০০৮ সালে। এখন আমরা ২০০৩ সালের নির্বাচনে নারীর অবস্থানের দিকে তাকাব।

২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে মোট ৫৮,৩৫৩টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই নিম্নতম স্তর গ্রাম পঞ্চায়েতে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ৩২২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসনের সংখ্যা ছিল ৪৯,১৪০।

সারণি ৬

২০০৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নারী ও পুরুষের ত্রিস্তরে সংরক্ষণ চিত্র

স্তর	মোট আসন	মহিলা বাদে জাতিগত সংরক্ষণ		মোট	মহিলা সংরক্ষণ				মোট মহিলা সংরক্ষণ	অসংরক্ষিত
		তপঃ জাতি	তপঃ উপজাতি		তপঃ জাতি	তপঃ উপজাতি	তপঃ জাতি/ উপজাতি মোট	সাধারণ		
গ্রাম পঞ্চায়েত	৪৯,১৪০	৮,৪৬৩	২০৩৩	১০,৪৭৬	৫,৪১৩	১,৩০৫	৬,৭১৮ (১৩.৬)	১০,৮৯৭ (২২.২)	(৩৬.৮)	২১,০২৯
পঞ্চায়েত সমিতি	৮,৫০০	১,৪৫২	৩৭৫	১৮২৭	৮৭৬	২১৪	১,০৯০ (১২.৪)	১৮৫৪ (২২.৮)	(৩৪)	৩,৭২৯
জেলা পরিষদ	৭১৩	১৩১	৩০	১৬১	৭১	১৯	৮০ (১১)	১৫৩ (২১.৫)	(৩৩)	৩০৯

* বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা শতাংশ নির্ণয় করছে।

সূত্র : *পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০০৩ : তথ্য ও সমীক্ষা*, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট) ২০০৪, ২১-২৪ এবং ৩৬-৩৯ পৃষ্ঠার পরিসংখ্যান থেকে সংকলিত।

আর ৩২৯টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ছিল ৮,৫০০। সর্বোচ্চ জেলা পরিষদ স্তরে ১৭টি জেলায় (দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদ বাদ দিয়ে) আসন সংখ্যা ছিল ৭১৩টি।[১১] পঞ্চায়েতের এই ৩টি স্তরেই মহিলারা (তপশিলী জাতি-উপজাতির মহিলা সহ) সংরক্ষিত আসনে কতখানি ক্ষমতা লাভ করেছেন, তা সারণি ৬-এ দেখানো হল।

সারণি ৬ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৩ সালে মহিলারা পঞ্চায়েতে ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ আসনে সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার পাওয়ার প্রায় ১০ বৎসর পরে তাঁদের অধিকৃত আসন সংখ্যার সামান্যই তারতম্য হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলারা অধিকার করেছেন প্রায় ৩৬ শতাংশ। এর মধ্যে তপশিলী জাতি-উপজাতির মহিলারা লাভ করেছেন ১৪ শতাংশের কাছাকাছি, আর ২২ শতাংশের বেশি লাভ করেছেন সাধারণ মহিলারা। পঞ্চায়েত সমিতিতে মহিলাদের দ্বারা অধিকৃত ৩৪ শতাংশ আসনের মধ্যে তপশিলী জাতি-উপজাতির মহিলারা লাভ করেছেন প্রায় ১৩ শতাংশ এবং সাধারণ মহিলারা প্রায় ২২ শতাংশ। আর সর্বোচ্চ জেলা পরিষদ স্তরে মহিলারা ন্যূনতম সংরক্ষিত ৩৩ শতাংশই লাভ করেছেন। এখানে তাঁদের অধিকৃত ৩৩ শতাংশের মধ্যে তপশিলী জাতি-উপজাতি মহিলাদের দ্বারা অধিকৃত আসনের শতাংশ হল ১১। আর সাধারণ মহিলারা লাভ করেছেন ২১·৫ শতাংশ।

লক্ষণীয় যে সারণি ৬ অনুযায়ী সর্বোচ্চ জেলা পরিষদে মহিলারা তাদের জন্য নির্দিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসনই শুধু লাভ করলেও পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে তাঁরা এক-তৃতীয়াংশের সামান্য কিছু বেশি আসন লাভ করেছেন। এর কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। জেলা স্তরেই শিক্ষা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় বেশি। যে সব সদস্যারা তুলনাক্রমে বেশি শিক্ষিত এবং পূর্বে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে বিভিন্ন পদে আসীন থেকে কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাঁরাই প্রধানত জেলা স্তরের নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন আর গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মহিলারা সাধারণত আসেন অল্প শিক্ষা এবং কিছুটা পারিবারিক রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে, অর্থাৎ পিতা, স্বামী, ভ্রাতা ইত্যাদির হাত ধরে। রাজনৈতিক সচেতনতা এবং বিশেষত শিক্ষা যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা আরও প্রমাণিত হয় তিনটি স্তরেই তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলাদের অধিকৃত আসনের শতাংশ থেকে। সারণি ৬ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি স্তরেই তপশিলী জাতি-উপজাতি মহিলাদের মোট অধিকৃত আসনের শতাংশ সাধারণ মহিলাদের অধিকৃত আসনের কম/বেশি অর্ধেক মাত্র। এর মধ্যে আবার তপশিলী উপজাতি মহিলাদের শতাংশ তপশিলী জাতির মহিলাদের প্রাপ্ত শতাংশের কাছাকাছিও নয়, অনেক কম। কোনো পরিসংখ্যানের দিকে না তাকিয়েও বলা যায়, বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারণে সাধারণ নারীদের থেকে তপশিলী জাতির নারীদের শিক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনতা, এবং অভিজ্ঞতা থাকে অনেক কম। আবার তপশিলী উপজাতির নারীদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে তপশিলী জাতির

নারীদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক জ্ঞান কিছুটা বেশি থাকে। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই সাধারণ এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতির মহিলাদের শতাংশ তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সর্বোপরি আর্থসামাজিক অবস্থানকেই প্রতিফলিত করেছে। স্বাভাবিক কারণেই এদের মধ্যে অল্প শিক্ষিত এবং অল্প বয়সী মহিলাদের অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী "Younger and educated women representatives in these institutions [Panchayats] had performed better...those educated showed a significant positive correlation with better performance of elected women representatives. On the other hand those who were illiterate or had been educated below the level of primary school, did not perform well." কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে "As women progress in their political career, they become better performers by virtue of being politically more aware and experience."[১২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৯৮ সালের নির্বাচনের পর আমাদের ব্যক্তিগত সমীক্ষাতেও এ রকমই দেখা গেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে সারণি ৬-এ দেওয়া ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিসংখ্যানের সাথে ২০০৭-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সমীক্ষা[১৩] তথ্যের কিছু অমিল আছে। মনে হয় কোনো কোনো স্থলে দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদকে ধরে গণনা করা এবং অন্যস্থলে এই পার্বত্য পরিষদকে বাদ দেওয়ার ফলেই এরকম ঘটে থাকতে পারে। অন্য কারণকেও বাদ দেওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে যে বহু ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমীক্ষার পরিসংখ্যান এক হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত তথ্যের সাথে বাস্তবের মিল হয় না।

সারণি ৭-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০০৩ সালের নির্বাচনের পর পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে নারীদের অবস্থান দেখানো হল।

সারণি ৭

২০০৩ সালের নির্বাচনে পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব

গ্রাম পঞ্চায়েত		
গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	মোট সদস্য/সদস্যা	নারী সদস্য
৩৩৫৪	৫১৪২১	১৭৫৫৪ (৩৪.১)*
তপশিলী জাতি	১৩৮৬৪	৫৩৩৪ (৩০.৩)**
তপশিলী উপজাতি	৩৩৪৩	১৩১০ (৭.৪)**
অন্যান্য	২৩৩৬	১০৯১০ (৬২.২)**

পঞ্চায়েত সমিতি		
পঞ্চায়েতে সমিতির সংখ্যা	মোট সদস্য/সদস্যা	নারী সদস্য
৩৩৩	৮৫৬৪	২৯৫০ (৩৪.৪)*
তপশিলী জাতি	২৪২৪	৮৮৪ (২৯.৯)**
তপশিলী উপজাতি	৬০১	২২০ (৭.৪)**
অন্যান্য	৫৩৯	১৮৫৪ (৬২.২)**
	জেলা পরিষদ	
জেলা পরিষদের সংখ্যা		
১৮	৭২০	২৪৮ (৩৪.৪)*
তপশিলী জাতি	১৯৮	৭১ (২৮.৬)**
তপশিলী উপজাতি	৫৩	১৮ (৭.২)**
অন্যান্য	৪৬৯	১৫৯ (৬৪.১)**

* মোট নারী শতাংশ। ** মোট নারী শতাংশের শতাংশ। তিনটি স্তরের সংখ্যা গণনায় দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের কিছু অঞ্চলকে ধরা হয়েছে। জাতি ও লিঙ্গ নির্ণয়ে দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে।

সূত্র : *Information on West Bengal Panchayats*, State Institute of Panchayats and Rural Development, Government of West Bengal, Kalyani, Nadia, 2007. ১৩৯ পৃষ্ঠার সারণি ১ এবং ২ থেকে সংকলিত।

সারণি ৭ অনুযায়ী সারা পশ্চিমবঙ্গে ১৮টি জেলায় মোট ৩৩৫৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫৯৪২১ জন নারী-পুরুষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে মহিলারা অধিকার করেছিলেন ১৭৫৫৪টি আসন অথবা ৩৪.১ শতাংশ আসন। নির্বাচিত এই ৩৪ শতাংশ নারীর মধ্যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি মহিলারা অধিকার করেছিলেন যথাক্রমে ৩০.৩ শতাংশ এবং ৭.৪ শতাংশ। মধ্যস্তরে ৩৩৩টি পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট নির্বাচিত মানুষের সংখ্যা ছিল ৮৫৬৪ জন। এদের মধ্যে ২৯৫০ জন অথবা ৩৪.৪ শতাংশ অধিকৃত হয়েছিল নারীদের দ্বারা। আর নারীদের মধ্যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি মহিলারা যথাক্রমে নির্বাচিত হয়েছিলেন ২৯.৯ এবং ৭.৪ শতাংশ আসনে। আর ১৮টি জেলা পরিষদে মোট নির্বাচিত ৭২০ জন মানুষের মধ্যে নারীরা সংখ্যায় ছিলেন ২৪৮ জন। অর্থাৎ তারা অধিকার করেছিলেন ৩৪.৪ শতাংশ আসন।

লক্ষণীয় যে তিনটি স্তরেই নারীদের দ্বারা অধিকৃত আসনের বেশির ভাগ (৬২ শতাংশেরও বেশি) লাভ করেছিলেন অন্যান্য সাধারণ নারীরা। আর তিনটি স্তরেই তপশিলী জাতি এবং উপজাতি সদস্যারা অধিকার করেছিলেন যথাক্রমে নিম্নতর এবং নিম্নতম স্থান। তপশিলী জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য সাধারণ নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থান ও শিক্ষার তারতম্যই এই পরিস্থিতির মূল কারণ বলে গণ্য করা যায়। আশার কথা এই যে ক্রমশ সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের নারীরাও রাজনৈতিক ক্ষমতার দরবারে উঠে আসছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩২২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধি ছিলেন ২১ শতাংশ। শুধু তাই নয়। এই নির্বাচিত মুসলিম প্রতিনিধিদের ৩৩ শতাংশ ছিলেন নারী। আর পঞ্চায়েত সমিতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত যে ১৮.৭ শতাংশ মানুষ নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ৩০.৩ শতাংশ ছিলেন নারী। সর্বোচ্চ জেলা পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধি ছিলেন ১৪.১৬ শতাংশ। এদের মধ্যে ৩৫.৬ শতাংশ অধিকার করেছিলেন নারীরা।[১৪] গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ পর্যন্ত ত্রিস্তর ভিত্তিক স্থানীয় স্ব-শাসনের ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীদের প্রতিনিধিত্ব (সামান্য হলেও) নারীদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতীক নয় কি?

নিয়ম অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদেও অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য (তপশিলী জাতি/উপজাতির মহিলা সহ) সংরক্ষিত থাকে।

সারণি ৮-এ ২০০৩ সালের নির্বাচনে মহিলা প্রধানদের সংখ্যা এবং শতাংশ দেখানো হল।

সারণি ৮

২০০৩ সালের নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধান

গ্রাম পঞ্চায়েতের	তপশিলী জাতি	তপশিলী উপজাতি	অন্যান্য	মোট
সংখ্যা	৪৪৩	১১৯	৭১৩	১২৭৫
৩৩২০	(৩৪.৭)	(৭.৩)	(৫৫.৯)	(৩৯.৬)

বন্ধনীর ভিতর শতাংশ দেখানো হল।

সূত্র : *Information on West Bengal Panchayats,* Government of West Bengal, State Institute of Panchayat and Rural Development, West Bengal, Kalyani, Nadia, 2007. p. 140.

সারণি ৮ থেকে দেখা যাচ্ছে যে মোট ৩২২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের আসনের মধ্যে ১২৭৫টি আসন নারীরা অলংকৃত করেছিলেন। অর্থাৎ নারীরা ৩৯.৬ শতাংশ প্রধানের আসন লাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি মহিলারা প্রধান রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে ৩৪.৭ এবং ৭.৩ শতাংশ আসনে। সর্বোচ্চ শতাংশ আসন লাভ করেছিলেন অন্যান্য নারীরা। আগেই দেখানো হয়েছে যে অন্য কিছু রাজ্যে মহিলা প্রধানরা, বিশেষত তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলা প্রধানরা, নানা রকম অপমান ও অত্যাচারের শিকার হন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এরকম ঘটনার কথা শোনা যায় না। যদিও এদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু সমালোচনা শোনা যায়। ক্ষেত্র সমীক্ষা ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের দক্ষতা এবং কার্যক্রম সম্বন্ধে বিশদ জানা সম্ভব নয়। তবে আমাদের নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষায় আগেই আমরা দেখেছি যে ২০০০-২০০১ সালেই নির্বাচিত মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গেই গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনা করেছেন। যদিও অনেক সময় পরিবারের সদস্যদের সাহায্য তাদের নিতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অল্প শিক্ষিত মহিলা প্রধানরা অসহায় বোধ করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পঞ্চায়েতের সাধারণ সদস্যারূপে তাঁদের পক্ষে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আরও প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করাই স্বাভাবিক।

২০০৩ সালের নির্বাচনের পর ১৭টি জেলা পরিষদের (দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদ বাদ দিয়ে) মধ্যে ৭টিতে সভাধিপতি রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন মহিলারা। এরা হলেন জ্যোৎস্না রানি সিংহ (উত্তর দিনাজপুর), সিদ্দিকা বেগম (মুর্শিদাবাদ), রমা বিশ্বাস (নদিয়া), অর্পণা গুপ্ত (উত্তর ২৪-পরগণা), কৃষ্ণা ব্যানার্জী (হুগলি), মিঠু সিং সরদার (পুরুলিয়া) এবং পূর্ণিমা বাগদি (বাঁকুড়া)। এছাড়া সহ-সভাধিপতির পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন শিখা রায় (কোচবিহার), ডলি রায় (উত্তর ২৪-পরগনা), নমিতা দে (পশ্চিম মেদিনীপুর) এবং মণিমালা দাস (বর্ধমান)।[১৫] এখানেও বলা যায় যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের মতো এবারের মহিলা সভাধিপতিদের মধ্যেও অনেকেই তাঁদের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শিক্ষা ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের দ্বারা আগে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, কর্মাধ্যক্ষা অথবা জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতির পদে আসীন ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, হুগলির সভাধিপতি কৃষ্ণা ব্যানার্জী ২০০৩ সালের আগে এই জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষা ছিলেন। আর সহ-সভাধিপতিরাও প্রাথমিকভাবে পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিয়েই নির্বাচিত হয়েছেন উচ্চতম জেলা পরিষদে। এটাই সাধারণ রীতি। আর এভাবেই স্তরে স্তরে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্রমোন্নতি ঘটছে।

উল্লেখ্য যে ২০০৮ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল এখনও সংকলিত না হওয়ার ফলে বর্তমানে পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে মহিলাদের

অবস্থান সম্বন্ধে কোনো আলোচনা সম্ভব নয়। ওয়েবসাইটেও কোনো সংকলিত তথ্য নেই।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় মহিলাদের রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো সমস্যা যদি থাকে, তবে তা আছে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নতুন আসা সদস্যাদের নিয়ে, এবং তা হল প্রধানত অশিক্ষা এবং অনভিজ্ঞতাপ্রসূত সমস্যা। তবে প্রথাগত স্কুল কলেজের শিক্ষা অপেক্ষা মনে হয় রাজনীতিতে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি, যা অর্জন করতে হয় কঠিন বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এ রকম অনেক সদস্যা আছেন যাঁদের প্রথাগত শিক্ষা স্কুলের নীচু শ্রেণীর মধ্যে সীমিত হলেও পরবর্তীকালে অনেকখানি শিক্ষা তাঁরা নিজগুণে ও চেষ্টায় অর্জন করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ব্লক-১-এর ধোসা-চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক প্রবীণ সদস্যা নিজেই জানিয়েছেন যে তিনি কোনোদিন স্কুলের দরজার ভিতরে পা রাখেননি, কিন্তু পরবর্তী জীবনে বাড়িতে বসে অনেকখানি পড়াশুনা শিখেছেন। ইনিও খবু সপ্রতিভ এবং স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনেক খবরই রাখতেন। ইচ্ছা এবং উদ্যোগের সমন্বয়ে অশিক্ষা ও অনভিজ্ঞতার সমস্যাকে অচিরেই অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। বড়ো কথা হল এই যে পঞ্চায়েতের সদস্যারা তাদের এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। আর এদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনারও কোনো অভাব নেই। অনেক মহিলাই নানাভাবে যা বলতে চেয়েছেন, তা একজন সদস্যা বলেছেন স্পষ্ট ভাষায়, "কুয়োর ব্যাঙ একবার যখন পঞ্চায়েতে এসেছি, আর ফিরে যাবো না। লক্ষ্য এখন সামনের দিকে।" এ বিষয়ে তাঁরা দৃঢ়মনস্ক। মনে হয় বাড়ির আবদ্ধ পরিবেশের বাইরে এসে এক ধরনের মুক্তির স্বাদও তাঁরা অনুভব করছেন। এই অনুভব ও দৃঢ় মনস্কতাই মহিলা সদস্যাদের চলার পথে বড়ো পাথেয়।

পাদটীকা

১. Neil Webster, *Panchayati Raj and Decentralisation of Development Planning in West Bengal (A case study)*, K.P. Bagchi & Company, Calcutta, 1992 ; Kristeen Wester-gaard, *People's Participation, Local Government and Rural Development: The Case Study of West Bengal*, Centre for Development Research, Copenhagen, 1986 ; Krishna Chakravarty, *Leadership; Faction, and Panchayati Raj : A Case Study of West Bengal*, Rawat Publications, Jaipur, 1993, Nirmal Mukherjee and Debabrata Bandopadhyay, *New Horizon for West Bengal's Panchayats*. *Government of West Bengal, 1993*.

২. Neil Webster, Ibid., pp. 51-52.
৩. Ibid., pp. 61 and 63.
৪. G. K. Lienten, "Caste, Gender and class in panchayat : case of Bardhaman, West Bengal", *EPW*, 18 July, 1992, pp. 1567-1574.
৫. Girish Kumar and Buddhadeb Ghosh, *West Bengal Panchayat Elections, 1993, A Study in Participation*, Institution of Social Sciences and Concept Publishing Company, 1996, p. 15.
৬. *Socio-Economic Profile of Panchyat Members : South 24-Parganas*, State Institute of Panchyats and Rural Development, West Bengal, Nadia, 1997, p. 26 ; *Socio-Economic Profile of Panchayat Members : Birbhum*, Government of West Bengal, Nadia, 1996, p. 25 ; and *Socio-Economic Profile of Panchayat Members : Nadia*, Government of Bengal, Nadia, 1996, pp. 25.
৭. Ibid., *24-Parganas*, p. 26 ; *Birbhum*, p. 26 ; and *Nadia*, p. 26.
৮. Ibid., *24-Parganas*, p. 24.
৯. Ibid., *Birbhum*, p. 14 ; and *Nadia*, p. 14.
১০. G.K. Lienten. *op. cit.*
১১. *পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০০৩ : তথ্য ও সমীক্ষা*, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, মে, ২০০৪, পৃ. ২০।
১২. *The Statesman*, 9 May, 2008 :
১৩. Information on West Bengal Panchayats, Government of West Bengal, Institute of Panchayats and Rural Development, Kalyani, Nadia, 2007.
১৪. *Representation of disadvantage Sections in West Bengal Panchayats, 2003*, State Institute of Panchayats and Rural Development, Government of West Bengal, Kalyani, Nadia, 2007. pp. 3, 5, and 55.
১৫. *পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০০৩ : তথ্য ও সমীক্ষা*, ঐ, পৃ. ৪৯।